সঙ্গীত:

শাস্ত্রকারগণ সঙ্গীতের সংজ্ঞা নিরাপণ করেছেন- "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং এয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" অর্থাৎ সঙ্গীত শব্দটিতে (সম + গীত) সম উপসর্গ দ্বারা গীতের অনুসঙ্গে বাদ্য ও নৃত্য আভাসিত হচ্ছে। গীত, বাদ্য ও নৃত্যকলাকে একত্রে সঙ্গীত শব্দে অন্তর্গত করে একে তৌয'ত্রিক অভিধায় ভূষিত করা হয়ে থাকে । শাস্ত্রে সঙ্গীত ও তৌর্যত্রিক (তূরীধ্বনি) সমার্থক শব্দ। 'গীত' শব্দের অর্থ মনোরঞ্জক স্বরসন্দর্ভ। "রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো গীতমিত্যভিধীয়তে"।

গীত, বাদ্য ও নৃত্যের পারস্পরিক সম্পর্কঃ গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনটি কলার একত্র সমাবেশকে সঙ্গীত বলা হলেও এই তিনটির প্রত্যেকটিই এক একটি পৃথক কলা। শাঙ্গ'দেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' উল্লিখিত আছে-

"নৃত্যং বাদ্যানুগতং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবৃত্তি চ।

অতো গীতং প্রধানত্বাদ ত্রাদাবভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের মধ্যে গীতেরই শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ নৃত্যে বাদ্যের অধীন, বাদ্য আবার গীতের অধীন। এইভাবে প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে গীতকে প্রধান, বাদ্যকে দ্বিতীয় এবং নৃত্যকে তৃতীয় কলা রূপে বর্ণনা করে দেখান হয়েছে। গীতকে প্রধান কলা বলা হয়েছে কারণ হিসেবে শারঙ্গদেব তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন 'কণ্ঠ' হচ্ছে ভারতী স্থান। এই কণ্ঠ বা ভারতী স্থান থেকেই 'বৈখরী' নাদ সঙ্গীতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সঙ্গীতের আদি ধ্বনি বা বৈখরীনাদ হল 'ওঙ্কার' ধ্বনি। এটি প্রথম কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় বলে কণ্ঠসঙ্গীতকেই প্রধান ও শীর্ষ আসন দেওয়া হয় সঙ্গীত ত্রয়ীর মধ্যে। (ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ ১৯৯)

ধ্বনি:

সঙ্গীত প্রধানত ধ্বনি বা sound থেকে সৃষ্ট হয়। ধনী দুই প্রকার যথা সঙ্গীত উপযোগী অর্থাৎ সাংগীতিক ধ্বনি(musical sound) এবং সঙ্গীত অনুপযোগী অর্থাৎ অ=সাঙ্গীতিকধ্বনি ধ্বনি (non musical sound)। সঙ্গীতে উপযুক্ত ধ্বনিকেই নাদ্ বলা হয়। বিশ্বের সবকিছুর মূল কারণ হলো নাদ্ বা ধ্বনি। ধরা যাক যে বাইরে থেকে উচ্চারিত একটি বর্ণ যা এসে পৌছলো কর্ণ রন্ধ্রে, এই উচ্চারণ মন্দ্র ও হতে পারে আবার তীব্রও হতে পারে। এই যে উচ্চারণ সমৃদ্ধ শ্রুতি একেই বলা হয় ধ্বনি। ধ্বনিরই নামান্তর হচ্ছে নাদ্।

নাদ্:

সংগীতে উপযুক্ত ধ্বনিকেই নাদ্ বলা হয়। নাদ্ ভিন্ন স্বর, গীত বা নৃত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। এই জগত নাদাত্বক। তাই শাস্ত্র নাদ্-কে ব্রহ্মের সঙ্গে একিভূত করে। তাই একে নাদ্-ব্রহ্ম বলা হয়। অর্থাৎ গীত- নৃত্য প্রভৃতি কোন কিছুই নাদ্ ছাড়া অসম্ভব। নাদ্-ই জগতের আত্মা। ন্-কার অর্থে প্রাণ আর দ্-কার অর্থে অগ্নি। এই দুইয়ের মিশ্রণে নাদ্-এর উৎপত্তি। নাদ্ প্রধানত দুই প্রকার। ১.আহত নাদ্ ও ২. অনাহত নাদ্।

গুরুর উপদিষ্ট মার্গে সাধনা দ্বারা অনাহত নাদ্ এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাদ্ জনমনোরঞ্জক নয়। আর আহত নাদ্-ই সংগীতের উৎপত্তিকারক। অতএব এই নাদ্-ই জনমনোরঞ্জক। এছাড়াও নাদ্ এর আরো পাঁচটি প্রকারভেদ আছে যথা-অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট এবং কৃত্রিম। সঙ্গীত সমীক্ষা ১

শ্রুতি:

"শ্রবণার্থস্য ধাতোঃ ক্তিন্প্রত্যয়ে চ সুসংশ্রিতে" - শ্রুতি কাকে বলে, শ্রুতির ভেদ এবং শ্রুতির উৎপত্তিগত বিশ্লেষণ নিয়ে ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে কিছু আলোচনা করেননি। মতঙ্গমুনিই সর্বপ্রথম তাঁর বৃহদেশী গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন। উপরের শ্লোকটিতে তিনি শ্রুতির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে বলেছেন, শ্রবণ 'শ্রু' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন' প্রত্যয় যোগ করে শ্রুতি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সংস্কৃত অভিধানে 'শ্রুতি' শব্দটির বহু অর্থ আছে যেমন- কর্ন , বেদ, বেদপাঠের স্বর, সংবাদ কাহিনী, শ্রবণযোগ্য সুক্ষা নাদ্ ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য শ্রুতির প্রত্যেকটি অর্থের সঙ্গেই কানে শোনার একটা সম্পর্ক রয়েছে।

স্বর ও সপ্তক আবিস্তৃত হওয়ার পরই গান্ধর্ব গুণীরা প্রতি স্বরের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম অপুষ্ট নাদ্ আবিষ্কার করেছিলেন। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অপুষ্ট নাদ্ গুলিকেই বলা হত 'অন্তর শ্রুতি' বা সংক্ষেপে 'শ্রুতি'। শ্রুতির ভেদ্ বোঝাতে গিয়ে মতঙ্গমুনি বলেছেন,

"শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।
সা চৈকা দ্বিবিধাজ্ঞেয়াস্বরান্তর বিভাগতঃ।

- অর্থাৎ, কর্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধ্বনিমাত্রই'শ্রুতি। সেই শ্রুতি স্বরশ্রুতি এবং অন্তরশ্রুতি ভেদে দু'প্রকার হয়। বিচিত্রভঙ্গিতে বেদ পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বৈদিক গুণীরা বুঝেছিলেন স্থূলভাবে একই পাঠ্যস্বরে স্বর-প্রক্ষেপণের ইতরবিশেষে ধ্বনির প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে পৃথক অনুভূত হয়। বেদপাঠকালে ধ্বনির এই ইতর বিশেষ পার্থক্যকে অর্থাৎ উচ্চারন ভেদকে বৈদিক গুনীরা 'স্বরশ্রুতি' বা শ্রুতিজাতি বলতেন। এর ভেদ ছিল পাঁচরকম- দীপ্তা, আয়তা, মৃদু, মধ্যা ও করুনা। এই নামগুলি শুনলেই এদের প্রয়োগ পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। সম্ভবত, এই বৈদিক স্থূল স্বরের অভ্যন্তরস্থ সুক্ষ সুক্ষ ভেদ পর্যবেক্ষন করে গন্ধর্বগুনীরা গেয়-স্বরের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ নাদগুলি অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। ফলে জন্ম হয় অন্তরশ্রুতি বা গন্ধর্ব শ্রুতির। ভরত সম্প্রদায়ের গুনীরা এক সপ্তকের অন্তর্গত ২২টি শ্রুতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্য সম্প্রদায়ের গুনীরা পৃথক সংখ্যা শ্রুতি মানতেন। যেমন অঞ্জনেয় হনুমান সম্প্রদায় এক সপ্তকের অন্তর্গত ১৮টি শ্রুতি মানতেন। যাইহোক, প্রায় সর্বসম্মত ২২টি সূক্ষ নাদ্ বা শ্রুতিকেই অন্তরশ্রুতি বলা হয়।

শ্রুতির বৈশিষ্ট্য:

স্বরের সূক্ষ, অপুষ্ঠ ধ্বনি হল শ্রুতি যা সংগীত সাধকগণমাত্রেই শুনতে সক্ষম হন। এই ধ্বনি সঙ্গীতোপযোগী শ্রুতিমধুর হয় এবং এদের পরস্পরের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। ২২টি শ্রুতির উপর স্বরস্থাপনের নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যেগুলি প্রবলভাবে শ্রবণযোগ্য সেগুলিকে বলে 'স্বর' আর অনুশীলিত শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বরের অন্তবর্তী যে সূক্ষ্মনাদগুলিকে শোনা যায় তা হ'ল 'শ্রুতি'। সংগীতের ক্রিয়াত্মক অংশে শ্রুতিকে মীড়, কণ, গমক ইত্যাদি অলংকরণের সাহায্যে কণ্ঠে বা যন্ত্রে প্রকাশ করা হয়। শ্রুতির উপর বিন্যস্ত স্বর কে স্থিরভাবে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও পণ্ডিতগণ ৬৬টি শ্রুতি ও অনন্তশ্রুতি কথা বলেছেন। "৬৬ শ্রুতি" বলতে মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিনটি সপ্তকে ২২×৩= ৬৬ বোঝায়। অনন্ত শ্রুতি শ্রবণযোগ্য নয়, কিংবা তাদের অতিসূক্ষ ভেদ সাধারণ মনুষ্য কর্ণে ধরা পড়েনা বলে- এই অনন্তশ্রুতি সংগীতে উপযোগী নয়।

স্বর:

মূনি মতঙ্গ স্বরের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে – 'রাগজনকাধ্বনি স্বর ইতি' – অথাৎ সঙ্গীত উপযোগী শ্রুতিমধুর ধ্বনিই হল স্বর। জগতে ধ্বনি অনন্ত, কিন্তু যে ধ্বনি স্নিগ্ধ ও অনুরণনাত্মক ও শ্রুতিমধুর তাই স্বর পদবাচ্য হয়। সঙ্গীত রত্নাকরে আচার্য শারঙ্গদেব স্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন – 'স্বতঃ রঞ্জয়তে শ্রোতৃচিত্তম্ স স্বর উচ্যতে'

– স্বর হল শ্রুতি সমূহের অনন্তর অনুরণনাত্মক স্নিগ্ধ ধ্বনি যা শ্রোতার চিত্তকে সততই অনুরক্ত করে। আওয়াজের (noise) সঙ্গে স্বরের পার্থক্য হল আওয়াজের অনুরণন হয় না, কিন্তু সাঙ্গীতিক স্বরের অনুরণনই প্রধান লক্ষণ। স্বর এই কারণেই সর্বদা আপেক্ষিক সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ একটি স্বর কণ্ঠে বা যন্ত্রে ধ্বনিত করলে তার অনুসঙ্গে অন্য স্বরও ধ্বনিত হয়। যেমন সা ধ্বনিত হলে ম ও প স্বর দুটি অনুরণিত হতে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সাঙ্গীতিক স্বরের উপসুর বা সহায়ক নাদ উৎপন্ন হয়।

বাইশ শ্রুতির অন্তর্গত সাতটি স্বর নিয়মাবদ্ধ ব্যবধানে অবস্থিত। গান ও বাজনার সুবিধার জন্য সঙ্গীতজ্ঞানীরা বাইশ শ্রুতি থেকে সাতটি শ্রুতিকে বেছে নিয়ে গান ও বাজনার যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করেন স্বর নাম দিয়ে। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ সাতটি স্বর। সংক্ষেপে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি বলা হয়।

সাংগীতিক স্বর দুই ভাগে বিভক্ত অচল স্বর ও চলস্বর। সা ও পা স্বরদ্বয়কে বলে অচল স্বর কারণ এ দুটির কোন রূপ পরিবর্তন ঘটে না। বাকি রে, গা, ধা, নি ও মা স্বরগুলিকে রূপান্তর ঘটিয়ে কোমল ও কড়ি / তীব্র স্বর রূপে সঙ্গীতে ব্যবহার করা হয়। স্বরূপ পরিবর্তন করা হয় ও শ্রুতি ও স্বরের স্থান পরিবর্তন ঘটিয়ে রূপান্তর করা হয় বলে এগুলিকে চল স্বর বলে। *ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ,২১৪।*

সপ্তক:

কোনো একটি নির্দিষ্ট নাদ স্থানের সপ্ত স্বরগুচ্ছকে একত্রে সপ্তক বলে । মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন নাদস্থানের তিনটি সপ্তক বা ত্রিসপ্তক হয়। চলতি কথায় এই ত্রিসপ্তককে উদারা, মুদারা ও তারা বলা হয়। প্রতি সপ্তকে বাইশটি শ্রুতি এবং শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে বারোটি স্বরের অবস্থান থাকে। এই বারোটি স্বরের মধ্যে সাতটি শুদ্ধ স্বরের সমস্টিকে 'সপ্তক' বলে। যন্ত্রসঙ্গীতে অতিমন্দ্র সপ্তক ও অতি-তার সপ্তকের ব্যবহার হয়। ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ,২১৫

বর্ন:বর্ন:

প্রাচীনকালে গেয় রচনাকে বর্ণ বলা হত। পরবর্তীকালে এ ব্যাখ্যা বদলে যায় এবং গান করতে গেলে যে যে ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাদেরকে বর্ণ বলা হয়। "গানক্রিয়োচ্যাতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরপিতঃ"(সংগীত রত্নাকর)

বর্ণমালী বর্ণনা করা বা বিস্তার করা। আলচ্য ক্ষেত্রে যে বিশেষ কাজ দিয়ে গানের স্বর সমষ্টির এক একটি পদ দেখানো হয়, সেই রকম কাজগুলিকেই বর্ণ বলা হয়। কথিত আছে বর্ণ চার রকমের।

১. এক স্বর ক্রম অনুযায়ী বার বার দেখানো কে **স্থায়ী বর্ণ** বলা হয়। স্থায়ী বলতে গেলে গানের বা গতের স্থায়ী, অস্থায়া প্রভৃতি বিভিন্ন কলিকে বোঝায় না, উচ্চারণ ভঙ্গি দিয়ে বিশেষ স্বরধ্বনির প্রয়োগকেই বোঝায়। যেমন- স স স, র র র, গ গ গ ইত্যাদি।

২. স র গ ম প ধ নি এইভাবে স্বরের পরপর আরোহণকে **আরোহী বর্ণ** বলা হয়।

৩. নি ধ প ম গ র স আরোহীর ঠিক বিপরীতভাবে ক্রমিক নেমে আসাকেই **অবরোহী বর্ণ** বলা হয়।

৪. স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী এই তিন বর্ণের মিশ্রণকে **সঞ্চারী বর্ণ** বলা হয়। উদাহরণ: স র গ র, ধ প ম গ, মা পা ইত্যাদি।

গীত-বাদ্যম, ১ খন্ড, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ,৪০

অলংকার:অলঙ্কার:

"বিশিষ্টং বর্ণসন্দভমলঙ্কার প্রচক্ষতে ॥" (সঙ্গীত রত্নাকর) ।

অলঙ্কার মানে ভূষণ বা আভরণ। ভরত বলেছেন :

"শশিনা রহিতেব নিশা বিজলেব নদী লত। বিপুষ্পেব

অবিভূষিতেব কাস্তা গীতিরলঙ্কারহীনা স্যাৎ"।।

-অমাবশ্যা রাত্রি, শুকনো নদী, ফলফুলহীন গাছ এবং নিরাভরণা নারী যেমন মনোহারী হয় না, তেমনি অলংকার বিহীন গান-বাজনাও মধুর শোনায় না। সঙ্গীতশাস্ত্রে অলংকারের অর্থ মনোহর স্বরবিন্যাস রচনা । বর্ণের সঙ্গে অলংকারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে ; তাই সঙ্গীতালঙ্কারকে বর্ণালংকার নাম দেওয়া হয়েছে । শব্দালংকারে যেমন অনুপ্রাস, যমক্, শ্লেষ, কাকু, বক্রোক্তি : অর্থালংকারে যেমন—উপমা, রূপক, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রেও সেই রকম ৫০/৬০ রকমের অলংকারের নাম দেখা যায়। শৃংখলাবদ্ধ নানা স্বরবিন্যাসে বহু রকমের অলংকার রচনা করা সম্ভব। তাই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন :

"অনন্তাস্তুতে শাস্ত্রেণ সমস্তেন কীর্তিতাঃ।"

- স্থায়ীবর্ণের ৭ টি, আরোহী বর্ণ ও অবরোহী বর্ণের ১২টি, সঞ্চারী বর্ণের ২৫টি অলংকারের নাম শাস্ত্রে দেখা যায়। এছাড়াও আরও ১০/১২ প্রকার সুন্দর সুন্দর অলংকারের নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

বর্ণের সঙ্গে অলংকারের প্রভেদ সহজে নজরে আসে না । কয়েকটি বর্ণের শৃংখলাবদ্ধ স্বরবিন্যাসে অলংকার রচিত হয়। অনেকে 'তান'-কে অলংকার মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তান ও অলংকার এক বস্তু নয় । তান যেহেতু গানের ভূষণ, সেই কারণে তানকে অলংকার মনে কর

অসমীচীন নয়। কিন্তু শাস্ত্রমতে অলংকার এক বিশেষ ধরণের স্বরগুচ্ছ; এটি ঠিক তান নয়। বর্ণে আমরা স স স, ন ধ প, স র গ, ধ প ম, ন স র গ—এই ধরণের নানা স্বরবিন্যাস দেখতে পাই। কিন্তু অলংকারের ক্ষেত্রে আমরা স গ র ম, র ম গ প, গ প ম ধ, ন প ধ ম — এই ধরণের স্বর-বিন্যাসের সম্মুখীন হই। (তানের কথায় তানের স র গ ম দ্রষ্টব্য।)

বাক্যের মধ্যে যেমন পদ গীতরূপ ভাষায় তেমনি বর্ণ। এই বর্ণের আলংকারিক রূপই অলংকার। তাই অলংকারকে বলা হয় "বর্ণালংকার"।
গীত-বাদ্যম, ১ খন্ড, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ,৪০,৪১

আলাপ:

আমরা এখানে আধুনিক আলাপ গায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আলাপ প্রধানত দুই প্রকার করা হয়। আকার দ্বারা ও নোম্ তোম্ দ্বারা। এই নোম্ তোম্ দ্বারা আলাপ সাধারণত ধ্রুপদ - ধামারে এবং আকার দ্বারা আলাপ খেয়ালে করা হয়। নোম্ তোম্ দ্বারা আলাপ গীতের পূর্বে বিস্তারিতভাবে করা হয় এবং সম্পূর্ণ আলাপ চার ভাগে যথা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগে বিভক্ত করা হয়। আকার দ্বারা আলাপ বিস্তারিতভাবে এবং খেয়াল গানে এই আলাপ করা হয়ে থাকে। কোন কোন গায়ক গীতের পূর্বে খুব অল্প পরিমাণে আলাপ করেন গীত অথবা গতের মধ্যস্থলের আলাপ ছোট হয় এবং কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ভাগের পরে গীতের অথবা গতের মুখরা ধরে সমের উপর মিলিয়ে দেওয়া হয়। উভয় প্রকার আলাপেই রাগের স্বরূপ চলন আরোহ অবরোহ বাদী সমবাদী ও পকড় ও ন্যস স্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।
সঙ্গীত জিজ্ঞাসা,রামপ্রসাদ রায়,৩৯

তান:

তান শব্দটি 'তন্' ধাতু 'ঘঞ্' -প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। তন - ধাতুর অর্থ বিস্তৃতি। অর্থাৎ কয়েকটি নির্দিষ্ট স্বরকে বিভিন্ন বিন্যাসে সাজানো। এই বিন্যাসের সময় স্বরের আরোহ অবরোহ ক্রমটি সুনির্দিষ্ট নাও থাকতে পারে।

মুনি নারদ তার শিক্ষা গ্রন্থে ষড়জ গ্রামের ১২টি তান, মধ্যমগ্রামের ২০টি ও গান্ধার গ্রামের ১৫ টি তানের উল্লেখ করেছেন। সর্বসমেত ৪৭ টি তান।

তান প্রসঙ্গে একটি জ্ঞাতব্য বিষয় হলো এই তান কথাটির সঙ্গে খ্যাল গানে প্রযুক্ত তানের কোন সম্পর্ক নেই। বিস্তৃতি বা বিস্তার অর্থেই তান কথাটির প্রয়োগ হয়। সেক্ষেত্রে খেয়াল গানে গায়কের অভিরুচি অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট রাগের নিয়মবদ্ধ স্বর পারম্পর্য রক্ষা করে যে কোন প্রকার ক্রমে স্বরকে সাজিয়ে তিনি রাগের বিস্তারিত অলংকরণ করে থাকেন। এটি রাগ বিস্তারের একটি বিশেষ অলংকরণ পদ্ধতি।

হিন্দুস্থানী খেয়াল, টপ্পা, তারানা ও ঠুমরীতে তানের প্রয়োগ হলেও সব শৈলির গানে এরকম তানালঙ্কার প্রয়োগ হয় না। খেয়াল ও টপ্পার তান বিভিন্ন প্রকৃতির। ভাব সমৃদ্ধ গান ভজন ও ঠুমরির তানের রচনা আবার অন্য প্রকার। গানের গতি অনুসারে দুগুণ, তিনগুণ, চার, ছয় ও আট গুণের তানালঙ্কারের স্বরগুলিকে আ-কার সহযোগে প্রয়োগ করা হয়। তানের স্বর রচনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে শুদ্ধতান, মিশ্রতান, কূট ও ছুট তান, গমক্ তান, বক্রতান, ফিরত্ তান, হলক্ তান, অলংকারিক তান ও বোল্ তান ইত্যাদি নানা প্রকার তান গানে প্রয়োগ করা হয়।

ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ ২৩৭

বাদী স্বর:

রাগোচিত মূখ্য স্বরটিকে বলে বাদীস্বর অর্থাৎ রাগ-গায়ন ও বাদনকালে যে স্বরটিকে সর্বাধিক প্রয়োগ করে রাগরূপ উন্মোচিত করা হয়। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতে সপ্তকের পূর্বাঙ্গে বা উত্তরাঙ্গে বাদীস্বরের অবস্থান অনুসারে রাগ গায়নের সময়কাল নির্ধারিত হয়। সপ্তকে বাদীস্বরের অবস্থান অনুসারে রাগগুলিকে পূর্বাঙ্গবাদী রাগ ও উত্তরাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। বাদী স্বরকে রাগের 'জান্'ও বলা হয়। প্রাচীনকালে বাদীস্বরকেই বলা হত 'অংশ স্বর'। ইমনের বাদী স্বর গ, বাগেশ্রী-র ম, বৃন্দাবনী সারং-এর 'রে' বাদীস্বর। ২৪ ঘন্টার দিনরাত্রির আবর্তনের সময়ের পূর্বভাগ ও উত্তরভাগের সঙ্গে বাদীস্বরের সম্পর্ক আছে।

ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ, ২১৬

সমবাদী স্বর :

রাগ পরিবেশনের সময় বাদী অপেক্ষা কম কিন্তু অন্যান্য স্বর অপেক্ষা বেশীবার যে স্বরটিকে প্রয়োগ করে রাগরূপ ফুটিয়ে তোলা হয় তাকে বলে সমবাদী স্বর।

বাদী-সমবাদী স্বরের ব্যবধান সাধারণতঃ দুই বা তিন স্বরের মধ্যে হয়ে থাকে। ইমনের বাদী গ, সমবাদী নি, বাগেশ্রীর বাদী ম. সমবাদী সা, বৃন্দাবনী সারং-এর বাদী রে, সমবাদী প।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রাগে বাদী-সমবাদী স্বরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবন্ধে বলেছেন যে এই দুটি স্বরের প্রয়োগ কুশলতাই রাগ অবয়বের মধ্যে রাগমূর্তিকে প্রকৃতরূপে প্রাণবান করে রস সঞ্চার করে। বাদীস্বর রাগছায়া প্রকাশ করে, তার রসভাবের ইঙ্গিত দেয় ও সমবাদী স্বর সেই রস ও ভাব বাস্তবে রূপায়িত হতে সাহায্য করে।

ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ,২১৭

বিবাদী স্বর:

যে স্বর কোনো রাগের নিয়মিত স্বর নয়, যে স্বর প্রয়োগে ঐ রাগের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় তাকে বলে রাগের বিবাদী স্বর। গুণী ও কুশলী শিল্পীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিবাদী স্বর প্রয়োগ করে রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি করেন। যেমন ভৈরব রাগে কোমল নি-র ব্যাবহার, ক্ষণকালমাত্র স্পর্শ করে ভৈরব রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বর্জিতস্বর ও বিবাদীস্বর এক নয়। বর্জিত স্বর রাগে কখনই ব্যবহৃত হয় না। বিবাদী স্বরও রাগে কখনই ব্যবহৃত হয় না কিন্তু বিবাদী স্বর রাগবিশেষে সুকৌশলে নিমেষ-কালমাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধির জন্য কুশলী শিল্পীদের দ্বারা।
ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ,২১৮

অনুবাদী স্বর:

বাদী সমবাদী ভিন্ন, রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য স্বরগুলিকে অনুবাদী স্বর বলা হয়। 'অনু' অর্থ অনুসরণ। বাদীস্বরকে যে স্বরগুলি অনুসরণ করে থাকে তাকেই অনুবাদী স্বর বলে।

ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ, ২১৭

আরোহ :

গান ও বাজনার সময় যখন স্বরগুলি ক্রমানুযায়ী উচ্চতায় উঠতে থাকে তখন তাকে আরোহ বলে। এক কথায় ক্রমানুসারে উপরে ওঠার নাম আরোহ। আরোহ বা আরোহণ শব্দের ভাষান্তর অনুলোম যার অর্থ অনুক্রম বা যথাক্রম। যেমন সা, রে, গ.ম, প, ধ, নি।

আরোহ-গতির সপ্তস্বরগুচ্ছ দ্বারাই ঠাট রচনা করা হয় কিন্তু রাগ রচনায় সর্বদাই আরোহ ক্রমটি বজায় থাকে না। বক্রগতির রাগ ও আছে। এ ছাড়া রাগের জাতি অনুসারে সাত, ছয় বা পাঁচ যে কোনো সংখ্যক স্বরেরই আরোহ হতে পারে।

ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ,২১৫

অবরোহ :

আরোহ ক্রমের বিপরীত গতিকে বলে অবরোহ। ক্রমানুসারে উচ্চ থেকে নীচে নামা যেমন সাঁ, নি, ধ, প, ম, গ, রে, সা। অবরোহ শব্দের ভাষান্তর বিলোম যার অর্থ উঁচু থেকে ক্রমানুসারে নীচে নামা। ঠাট রচনায় অবরোহণ বা অবরোহ ক্রমের প্রয়োজন হয় না। রাগ রচনায় অবরোহ থাকবেই, তবে তার ক্রমটিকে স্বাভাবিক ক্রমের পারম্পর্য বজায় নাও থাকতে পারে। শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সাতটি, ছয়টি বা পাঁচটি যে কোনো সংখ্যক স্বর দিয়েই রাগের অবরোহন রচিত হয়। তদেব

পকড়:

যে স্বল্প সংখ্যক স্বরবিন্যাসের দ্বারা রাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয় বা রাগ রূপ উৎঘাটিত করা হয় তাকে পকড় বলে। হিন্দি 'পাকাড়' শব্দটির অর্থ ধরা। যখন ভুপালী রাগে গ, রে, সা ধ, সা রে গ, গাওয়া হবে তার থেকেই বোঝা যাবে এটি ভূপালী রাগ। আবার ভীমপলশ্রী রাগের পকড় নি. সা ম, গ, প ম গ, ম গ রে সা গাইলেই বোঝা যাবে এটি ভীমপলশ্রী রাগ।

তদেব ২১৬

জাতি:

রাগ রচনার নিয়মানুসারে আমরা জানি ৫ টি র কম বা ৭ টি র বেশী সংখ্যক স্বর দিয়ে রাগ রচিত হয় না। ৫, ৬ ও ৭ স্বরের বিভিন্ন সমন্বয়েই বিভিন্ন রাগের উৎপত্তি। রাগটির আরোহন-অবরোহন কয়টি স্বর বিশিষ্ট সেই অনুসারে রাগের 'জাতি' নির্ণীত হয়। সেই অনুসারে রাগের তিনটি 'জাতি'– ঔড়ব (৫) ষাড়ব (৬) ও সম্পূর্ণ (৭)। এদের সমন্বয়ে আরো নয়টি জাতির উৎপত্তি। দুই একটি করে উদাহরণসহ:

ঔড়ব-ঔড়ব – ভূপালী, মালকোষ, বৃন্দাবনী সারং।

ঔড়ব-ষাড়ব — রাগেশ্রী, সোহিনী, শংকরা।

ঔড়ব-সম্পূর্ণ— আশাবরী, দেশ, ভীমপলশ্রী, মুলতানী।

ষাড়ব-ষাড়ব — মারোয়া, পুরিয়া, আড়ানা, বাহার।

ষাড়ব-ঔড়ব — জয়রাজ (অপ্রচলিত)।

ষাড়ব-সম্পূর্ণ — খাম্বাজ, মালগুঞ্জী, পরজ (মতান্তর আছে)।

সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ — ইমন, বিলাবল, কাফী, ভৈরব।

সম্পূর্ণ-ষাড়ব — দরবারী কানাড়া, খাম্বাবতী, মিঞামল্লার।

সম্পূর্ণ -ঔড়ব — নট।

- 'ম' ও 'প' কোন জাতির রাগেই একসঙ্গে বর্জিত হবে না।